শর্বরী রায়চৌধুরী

রমন শিবকুমার

শর্বরীদার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল কয়েকমাস আগে। পুত্র সৌরভ ওকে নিয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে। শর্বরীদা তখন শারীরিকভাবে দুর্বল, চলাফেরায় পরের ওপর নির্ভরশীল, তা সত্ত্বেও এসেছিলেন রবীন্দ্র- ভবনে সদ্য স্থাপিত দুটি ভাস্কর্য দেখতে। একটি তার প্রিয় ছাত্র রাধাকৃষ্ণনের, অন্যটি তার পুরোনো বন্ধু রামচন্দ্রনের সৃষ্টিকর্ম। আমার হাতে ভর করে শর্বরীদা দেখছিলেন ভাস্কর্যগুলো, তারপর দেখা হয়ে গেলে গাড়িতে ওঠবার সময় আমায় আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন তার বাড়িতে যাবার জন্য, ঠিক আগের মতোই। আমিও কথা দিলাম যাব বলে। দুর্ভাগ্যবশত তা হয়ে ওঠেনি। এটা ঠিকই যে ক্রমশ তার শারীরিক অবনতি ঘটছিল, কিন্তু ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু ওঁকে ছুঁয়ে ফেলবে।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যখনই সে আসে সবরকম আলাপচারিতা স্তব্ধ করে দেয় কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু মৃত্যু সবকিছুর শেষ নয়। মৃত্যুর সঙ্গে শুরু হয় আরেক নতুন জীবন, নতুন পরিক্রমা এবং এক নতুন সংলাপ। এই সংলাপ চলতে থাকে তাদের মাধ্যমে ও তাদেরই মধ্যে যাদের জীবনকে স্পর্শ করেছিলেন এই মানুষটি যিনি শরীরী জীবনে আজ ইতি টেনেছেন। আজ আমরা যে একত্র হয়েছি শর্বরীদাকে স্মরণ করার জন্য, এটা যেন তারই ইঙ্গিত বহন করে।

এই নতুন জীবনে ও শর্বরীদার সঙ্গে আমাদের এই নতুন আলাপচারিতায় উঠে আসবে অনেক দিক। পরিবার ও নিকটজনের স্মৃতিতে অবশ্যই বেঁচে থাকবেন তিনি। বেঁচে থাকবেন তাদের মধ্যেও যারা শর্বরীদাকে চিনতেন ঘনিষ্ঠভাবে— যারা তার ভালোবাসা পেয়েছেন এবং তাকে ভালবেসেওছেন নিঃশর্তে। একজন মানবিক উষ্ণতার মানুষের জন্য এটাই বোধহয় অন্তিম উপহার। শর্বরীদার জন্যও যে এই উপহার অনিঃশেষ, বলাই বাহুল্য।

শিল্প-রসিক ও শিল্প-ঐতিহাসিকরা শর্বরীদাকে মনে রাখবেন এক প্রতিভাশালী ভাস্কর ও সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে এবং আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যে তার তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের জন্য। ১৯৮৪ সালে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন শর্বরীদা এবং শুরু হয় তাঁর ভাস্কর-জীবন। কিন্তু, অল্পদিনের মধ্যেই কলেজ ছেড়ে দিলেন এবং ভাস্কর প্রদোষ দাসগুপ্তের কাছে একান্তে পাঠ নিতে শুরু করলেন। তারপর গুরুর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার 'গভর্নমেন্ট কলেজ অফ্ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট'-এ চলে এলেন যখন প্রদোষ দাশগুপ্ত সেখানকার অধ্যক্ষ হলেন। শর্বরীদা যে প্রতিষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তির চেয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ককেই মূল্য দিয়েছেন বারবার, এটা যে তারই আগাম ইঙ্গিত। পরবর্তীকালে বরোদা গিয়ে শিল্পী শঙ্খ চৌধুরীর কাছে ভাস্কর্যের পাট নেন কিছুদিনের জন্য এবং এরও পরে একবছরের জন্য শিক্ষানবিশি করেন ইতালিতে ফ্লোরেনসের 'আকাদেমি অফ্ আর্টস'-এ।

পেশাদারি জীবনের শুরুর দিকে, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে অল্প কদিন অধ্যাপনাকালটুকু বাদ দিয়ে, শর্বরীদা মূলত স্বাধীনভাবে শিল্প-সাধনা করে গেছেন, সৃষ্টি করেছেন কিছু অবিস্মরণীয় ভাস্কর্য, দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন ও সাক্ষাৎ করেছেন আধুনিক শিল্পের কয়েকজন দিকপালদের সঙ্গে। এই ফলপ্রসূ পর্যায়ের শেষে ১৯৬৯-এ শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। তখন তার বয়স ছত্রিশ এবং ইতিমধ্যেই ওই প্রজন্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তী সাতাশ বছর ধরে কলাভবনে অধ্যাপনা করেন এবং শান্তিনিকেতনকেই তার বাকি জীবনের বাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন।

সে কালের শান্তিনিকেতনে গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকর ছিলেন অনেকেই, কিন্তু ভাস্কর বলতে একজনই, রামকিঙ্কর। শর্বরীদা কলাভবনে যোগদান করার পর, তার নতুন পরিচয় কেবল একজন তরুণ অধ্যাপক নয়, সবার প্রত্যাশা তিনি হবেন রামকিঙ্করের উত্তরাধিকারী। হয়তো কঠিন কাজ, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনিই হয়ে উঠলেন রামকিঙ্করের যোগ্য উত্তরসূরি; তাদের শিল্পকর্ম একেবারে ভিন্ন গোত্রের হওয়া সত্ত্বেও। এখানে রামকিঙ্করের পরিচিতি ও খ্যাতি মূলত তার বিশাল আকৃতির, তেজস্বী মানুষের অবয়ব-কেন্দ্রিক পারিবেশিক ভাস্কর্যের জন্য। অন্যদিকে শর্বরীদার মুনশিয়ানা ছোটো আকারের ভাস্কর্যে; তার কাজ অন্তরঙ্গ সংবেদনে নির্মিত। রামকিঙ্করের কাজ যদি হয় প্রবল শক্তিমান ও বীররসাত্মক, শর্বরীদার কাজ মনোমুগ্ধকর ও নমনীয়তায় সমৃদ্ধ। আমরা, দর্শকের, বিস্ময়ে ভাবি সেই সুসংবেদী ভাস্করের কথা যার সুকুমার আঙুলের চলনে মাটি হয়ে ওঠে মানব-শরীর। দুজনেই দক্ষ প্রতিকৃতি-শিল্পী কিন্তু যদিও দুই ভিন্ন শৈলিতে। কিন্তু মনে হয় যে এদের মধ্যে কিছু মিলও ছিল। দুজনেই, যে যার নিজের মতো করে অস্বীকার করেছেন দৈনন্দিনতাকে এবং ফলত ব্যবধান তৈরি হয়েছে চারপাশের মানুষের থেকে। এইটাই চোখে পড়েছিল যখন শর্বরীদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় আমার ছাত্রবয়সে সত্তরের দশকের শুরুর দিকে। দেখেছিলাম এক বিচিত্র ব্যক্তিত্বকে। তার পরিধেয় বস্ত্র ছিল উজ্জ্বল রঙ-এর, পরতেন বিচিত্র নকশা-সম্বলিত কুর্তা, প্রায়ই দাড়ি সাজিয়ে তুলতেন এতটা ফুল গুঁজে, কখনও রিকশাওয়ালাকে আসনে বসিয়ে নিজেই রিকশা চালিয়ে পৌঁছে যেতেন গন্তব্যস্থানে। একজন 'ভদ্রলোকের' পক্ষে এইধরনের জীবনযাপন অন্য মানুষের কাছে খুবই অপিরিচিত; তাই স্পষ্টতই শর্বরীদা হয়ে উঠলেন রীতিবহির্ভূত এক মানুষ। কিন্তু এছাড়াও শর্বরীদার মধ্যে ছিল অপ্রত্যক্ষ ও আরও গভীর এক প্রথাবিরুদ্ধতা।

আগেই বলেছি, প্রাতিষ্ঠানিক ঘেরাটোপে শর্বরীদা কখনওই স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। পেশাদারি সম্পর্কের থেকে ব্যক্তিগত যোগাযোগেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন এবং একজন শিক্ষক হিসেবে অনায়াসেই সদ্য আর্ট কলেজে আসা একজন অল্পবয়সী ছাত্রের বন্ধু হয়ে যেতে পারতেন। তাঁর এই নিঃসংঙ্কোচ উদারতায় আমিও স্বচ্ছন্দ বোধ করেছিলাম প্রথম আলাপেই। এর ফলে তাকে আরও কাছ থেকে জানাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রাতিষ্ঠানিক মানুষ না হবার ফলে, শর্বরীদা কখনওই সুপরিকল্পিতভাবে বা বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে পাঠদান করেননি; তিনি অনুপ্রাণিত করতেন এবং তার উদ্দীপনা ছিল বেশ ছোঁয়াচে। সুবিখ্যাত আধুনিক শিল্পীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের গল্প বলতেন প্রায়ই। জিয়াকোমেত্তি, হেনরি মুর, মারিনো মারিনি, ওস্‌সিপ জ্যাডকিন, নাম গাবো ইত্যাদি দিকপালদের স্টুডিওর কথা, তাঁদের সঙ্গে শর্বরীদার কথোপকথন—এইসব উদ্দীপক স্মৃতিচারণায় আমরাও অনেক কাছ থেকে পেয়ে যেতাম ওই সমস্ত শিল্পীদের। শর্বরীদা তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ খুলে বই বার করে দেখাতেন তার প্রিয় শিল্পকর্মের ছবি। কোনও বৌদ্ধিক বিশ্লেষণে যেতেন না, কিন্তু তাঁর আগ্রহ, উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়ে যেত শিক্ষক থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। সে সময়ে আমার মতন একজন আধুনিকতায় বিভোর তরুণ ছাত্রের কাছে এ যেন আধুনিক শিল্পের উৎকর্ষের সংযোগে থাকতে পারার সুযোগ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

শর্বরীদার সৃষ্ট বহু আদৃত সঙ্গীতকারদের প্রতিকৃতিগুলোর মধ্যে দিয়ে তার নিজের সঙ্গে এই উৎকর্ষের সংযোগ প্রতিফলিত হয়। একাধারে সঙ্গীত-রসিক, সংঙ্গীত-সংগ্রাহক, সঙ্গীতকারদের বন্ধু শর্বরীদা তার ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিতেন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মনোমুগ্ধকর জগতের সঙ্গে। শ্রোতা হিসেবে শর্বরীদার সঙ্গী হতে আমরা প্রায়ই আমন্ত্রিত হতাম তার বাড়িতে। বিশেষ করে ছুটির অবকাশগুলোতে, এই গানবাজনা শোনা শুরু হত সকাল থেকে এবং গড়িয়ে যেত পরদিন ভোররাত অবধি। কোনও ঘরি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত না এই সঙ্গীত শোনার আসরগুলো। তার প্রথম জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলির মতই, এই আসরগুলিও চলত নান্দনিক চাহিদার দ্বারা, নিত্যদিনের যুক্তিতে নয়। কখনও আমরা গোটা রাত্রি হয়তো শুনেছি কেবল একজন শিল্পীরই রেকর্ড, কখনও বা কোনও একটি বিশেষ ঘরানার বিভিন্ন গায়কদের পরিবেশন অথবা বিশেষ একটি বাদ্যযন্ত্রের নানান শিল্পীদের বাজনা। এই আসরগুলোর আমাদের কাছে ছিল ততটাই শিক্ষামূলক যতটা চিত্তবিনোদন। এই ধরনের কতগুলো আসরের কথা ছবি মতো স্পষ্ট মনে পড়ে। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় সন্ধ্যা যা আমার মনে আজও গেঁধে আছে— রোশনারা বেগমের বর্ষার রাগের রেকর্ডিং। শর্বরীদার বাড়ির বাগানে বসে একটা গোটা সন্ধে শুনেছিলাম রোশনারা বেগম। অন্ধকারে আকৃতিতে দেবদারু গাছ আর সেই গাছগুলোর ওপর দিয়ে পশমের মতো মেঘে আনাগোনা। সেদিন প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে গানের অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল রোমহর্ষক, আবার ওই গানের জন্য পরিবেশে লেগেছিল জাদুকাঠির ছোঁয়া; এ যেন এল গ্রেকো-র টোলেডো সেদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এইধরনের একটি অভিজ্ঞতা গোটা জীবনকে মূল্যবান করে তোলে। এইরকম একটি অসাধারণ নান্দনিক মুহূর্ত উপহার দেবার জন্য শর্বরীদার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব সারাজীবন।

এই লেখাটির মূল ইংরেজি পাঠ রচিত হয়েছিল ৫মার্চ ২০১২ শর্বরী রায়চৌধুরীর স্মরণসভা উপলক্ষে।
অনুবাদ: সৌমিক নন্দী মজুমদার